KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA

E CONTENT

DEPARTMENT: MUSIC

SEMESTER:VI(PROGRAMME)

SESSION: 2019-2020

SUBJECT: HISTORY OF INDIAN MUSIC

APMUS/603/GE-2

TOPIC- KIRTAN

NAME OF TEACHER: PROF. SANGITA SARKAR DEY

কীর্তন

ভূমিকা –

"নাম-লীলা গুণাদিনাম উচ্চৈভাষা তু কীর্তনম্"। অর্থাৎ ভগবানের নামলীলা, গুণ ইত্যাদি উচ্চৈস্বরে বর্ণনা করার নাম

কীর্তন। 'কৃৎ' ধাতু (প্রশংসা করা) থেকে কীর্তন কথার উদ্ভব। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণনাত্মক প্রশংসা গীতি থেকে কীর্তন শব্দটি উদ্ভত বলা যায়। বিশেষ করে রাধা- কৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতই কীর্তন নামে অভিহিত। এই গান শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ গানের অভিন্ন রূপ।

- কীর্তনের জন্ম ঠিক কবে তা জানা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সময়কাল প্রাক-চৈতন্য যুগে

জয়দেবের সুললিত পদাবলী শোনা যায় (গীতগোবিন্দ)। তবে কীর্তন বলতে যা বোঝায় তা এসেছে ষোড়শ শতাব্দীতে রোগীগুলোদেবের আবির্ভাবের পর , কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দপ্রভু প্রেমধর্ম প্রচার-মানসে কীর্তনের সাহচর্যে আপামর জনসাধারণকে নামামৃতদানে অনির্বচনীয় আনন্দ দান করেন। এজন্য অনেকেই তাঁদের কীর্তনের প্রবর্তক বলে থাকেন। কীর্তন প্রধানতঃ দুপ্রকার। যথা- নামকীর্তন বা হরিসংকীর্তন এবং পদকীর্তন, লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন।

নামকীর্তন-

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ।'

ভগবানের এই নাম অথবা এর সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ'- জুড়ে দিয়ে বিভিন্ন ছন্দ ও তালে ভিন্ন ভিন্ন সময়োপযোগী রাগে সমবেত কণ্ঠে গাওয়াকে 'নামকীর্তন' বা 'হরিসংকীর্তন' বলে। চিত্তশুদ্ধিলাভই এর সার্থকতা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার সঙ্গে শুধু নামকীর্তন বা হরিসংকীর্তন করতেন।

পদকীর্তন – পদকীর্তন বা লীলাকীর্তন মহাপ্রভুর সময় থেকেই প্রচারিত হয়ে বৈষ্ণব সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা অব�

বাংলার নিজস্ব সম্পদ-

'কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি। মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে স্বীয় হিল যতগুলি।' কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাদ্যযন্ত্র মতে- কীর্তন-গান বাংলার একান্ত নিজস্ব সব পদ। মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র মহামায়ায় ভক্তি-রস-পিপাসু শ্রোত্ববর্গের সমবেত আসরে গীত হয় রাধাকৃষ্ণ- লীলা-মাধুরী এবং বাংলার প্রচলিত রাগররামানের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় তার কোমল মধুর রূপ-বিস্তার। মূল গায়কের কন্ঠ-নিঃসৃত সুর-লহরীর মধ্যস্থতায় এবং সহযোগী শিল্পী-গায়কদের সহযোগিতায় কবি-হৃদয়ের ভাবাকৃতি সাবলীলভাবে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়।

রসের সমাবেশ –

'শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতমূর্তি'- - তাই প্রত্যেক কীর্তন গানের ভেতর দিয়ে রস প্রকটিত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য রসের বর্ণনা করেছেন এবং গোস্বামীগণ শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দিয়েছেন। শৃঙ্গাররস এই দশপ্রকার দু'প্রকার – বিপ্রলম্ভ বা বিরহ এবং সম্ভোগ বা মিলন। পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্র ও প্রবাস এই চারটি হল বিপ্রলম্ভের প্রকারভেদ এবং সম্ভোগের চারটি প্রকার হল - সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। পদকীর্তনে সাধারণতঃ পাঁচটি রসের সমাবেশ করা হয়েছে। যথা- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। তবে মধুর রসের আধিক্য এতে বেশী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও এই রসকেই উচ্চাসন দিয়েছেন

বিশিষ্ট দিক –

কীর্তন-গানের দুটি বিশিষ্ট দিক হল গীত-অঙ্গ ও তাল- অঙ্গ। গীত-অঙ্গ ও তাল-অঙ্গের অদ্বৈত সমন্বয়ে কীর্তন-গানের কায়া-বিগ্রহ নির্মিত। সূচনায় কীর্তন-কলাবিদ্ গায়ক রাধাভাব-বিলসিত গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদ গান করে 'গৌরচন্দ্রিকা'র অবতারণা করেন। বলাবাহুল্য, এই 'গৌরচন্দ্রিকা'র পদ মূল কীর্তন-গানের ভাব-রসানুসারী হয়ে থাকে। 'গৌরচন্দ্রিকা'র মধ্যস্থতায় চিত্ত- পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে কীর্তনের মূল রসে অবগাহন করানোই কীর্তন-গানের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কীর্তন-গানের গায়ক একাধারে শিল্পী, ভক্ত এবং ভাষ্যকার। গানের মাঝে মাঝে পদের অতিরিক্ত 'আখর' যোগ করেন তিনি। 'আখর' অংশ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং এখানেই তিনি সার্থক সংযোজক। এই আখরের মাধ্যমে কীর্তনের মূল ভাব ও রসের ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে সহজ ও মর্মস্পর্শী।

বাদকের ভূমিকা –

কীর্তনে গায়কের মত বাদকেরও অনুভূতিপ্রবণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাব্যের ভাবের সঙ্গে সুরের মেলবন্ধন না ঘটলে যেমন রস-সঞ্চার হয় না, ঠিক তেমনি ভাব অনুযায়ী তালের লয় ও ছন্দ প্রযুক্ত না হলে রস সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি ঘটে। কীর্তনে আখরের মাধ্যমে স্তরে স্তরে বিস্তৃত লাভের দ্বারাযেমন উপযুক্ত ছন্দ ও লয় প্রয়োগ করে গানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো হয়, বাজনার এই প্রক্রিয়াকে 'কাটান' বলে। সুতরাং গায়ক ও বাদকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কীর্তনের অনির্বচনীয় রস আস্বাদন করা যায়।

রাগ-রাগিনীর ব্যবহার –

পদাবলী কীর্তনে ভৈরবী, ভূপালী, টোড়ী,গান্ধার, কামোদ, শ্রী, ভাটিয়ার, রামকেলী, ধানশী, সিন্ধুড়া, বিভাস, মঙ্গল, মল্লার, বরাড়ী, কল্যাণী, মায়ুরী, আহিরী, গৌড়ী, বিহগড়া, পাহাড়ী, কেদার, পটমঞ্জরী, ললিত, বিভাস ললিত, ললিত ভৈরবী, গুর্জরী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অধিকাংশই লোচনের 'রাগতরঙ্গিনী' পণ্ডিত শুভঙ্করের 'সঙ্গীত দামোদর এবং ঘনশ্যাম দাসের 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। কীর্তনের রাগ-রাগিনী, তাল ও শাস্ত্র-নিয়মানুবর্তিতা থেকে মনে হয় যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পূর্ণ আদর্শ নিয়েই কীর্তনের সৃষ্টি।

তালপ্রয়োগ –

কীর্তনে যত প্রকার তালের প্রচলন আছে কোন ভারতীয় সঙ্গীতে তত প্রকার তালের ব্যবহার দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, এতে যেমন বিলম্বিত, দ্রুত লয় ও দুরুহ তালের প্রয়োগ দেখা যায়, তা অন্য কোন সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায় না। শোনা যায় যে, গরাণহাটি, মনোহরশাহী, রেণেটী ও মন্দারিনী পদ্ধতিতে যথাক্রমে ১০৮, ৫৪, ২৬ ও ৯টি তাল প্রচলিত ছিল। কীর্তনে ব্যবহৃত তালের মধ্যে লোফা, রূপক, যতি, তেওট, দশকোশী, ঝুমুর, ঝাঁপতাল, জপ, ধামাল, দোটুকী, দাশপেড়ে, মন্ঠক, প্রতিমন্ঠক, জয়মঞ্জল, কন্দর্প, একতালী, ধড়াপট, আদিঅষ্ট, মধুর, বিজয়ানন্দ, উৎসাহ, শেখর, সম, নন্দন, চন্দ্রশেখর, ধ্রুব প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে এই তালগুলি অবলুপ্ত হতে চলেছে। বর্তমানে মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট তালে কীর্তন গাওয়া হয়ে থাকে।

পদ-কীর্তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপ —

১। কীর্তন গাওয়ার পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা বা মহাপ্রভুর বন্দনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বিগ্রহে কখনও রাধা-ভাবে কখনও বা কৃষ্ণ-ভাবে আবিষ্ট থেকে মহাপ্রভুর সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার বর্ণনাই হল গৌরচন্দ্রিকা। এই গৌরচন্দ্রিকা থেকে পরে কী ধরণের পদ গীত হবে তা বোঝা যায়।

২। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে কীর্তন গান শুরু করা হয়।

৩। কীর্তন গান একটানা গাওয়া হয়- স্থায়ী ইত্যাদিতে ফেরা হয় না।

৪। কীর্তন গানে একজন মূল গায়ক থাকে। পারিপার্শ্বিক বা ধুয়াধারী গায়কদের দোহার বলা হয়।

৫। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর সুরে কীর্তন রচিত হলেও এতে ভাবের প্রাধান্যই বেশী।

৬। কীর্তনের বিভিন্ন অংশে একাধিক তালের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

৭। কীর্তনে রস-সৃষ্টির জন্য আখর ব্যবহার করা হয়।

৮। কীর্তনের শেষ অংশে মাতন থাকে।

৯। কীর্তনে তেওট, দশকুশী, দাশপাহিড়া, দোর্তুকী, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লোফা প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। লয়-ভেদে উক্ত তালগুলি দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত

- এই তিনভাবে ব্যবহৃত হয়।

১০। শ্রীখোল ও করতাল হল কীর্তনের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র।

হাতুটি –

পদাবলী কীর্তনে শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করে একাগ্রতা সঞ্চারের জন্য প্রথমে 'হাতুটি' (মহাপ্রভুকে স্মরণ করে শ্রীখোল) বাজানো হয়। হাতুটির পর গায়ক স্তব করেন এবং তারপর গৌরচন্দ্রিকা শুরু করেন। পরবর্তী স্তরে লীলাকীর্তন করে যুগল মিলন দিয়ে কীর্তন শেষ করা হয়। এরপর অধিবাস করে নামসংকীর্তন শুরু হয়। বিভিন্ন প্রহরে এই কীর্তন চলে। নাম কীর্তন শেষ করে আবাল-বৃদ্ধ বনিতায় নগর কীর্তন করা হয়। নগর কীর্তনান্তে মহোৎসবের মাধ্যমে কীর্তন গানের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

গৌরচন্দ্রিকা –

পদাবলী কীর্তন গাইবার পূর্বে গৌরাঙ্গের রূপগুণাদির বর্ণনা করে যে অংশটুকু পরিবেশন করা হয়, তাকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলে।

আখর-

কীর্তন গাইবার সময় পদের ভাষার ভাব পরিস্ফুট করারজন্য যে স্বরচিত বা সংগৃহীত পদাংশ যোগ করা হয় তাকে 'আখর' বলে। রবীন্দ্রনাথ আখরকে 'কথার তান' বলেছেন। কীর্তন গানে অনেক সময় কবিতার ভাব-গম্ভীর, দুর্বোদ্ধ জটিল অর্থকে সুবোদ্ধ করার জন্য আখর প্রয়োগ করা হয়। আখর প্রয়োগের মাধ্যমে কীর্তন গায়ক তার কবিত্ব-শক্তি, রসবোধ ও সুরবোধের পরিচয় দিয়ে থাকেন। বড় কীর্তনীয়ার গুণপণার মাপকাঠি হল আখর যোজনা। মার্গ সঙ্গীতে ওস্তাদদের কালোয়াতি যেমন সুরের তানে কীর্তন গানে প্রেমিক তেমনি কথার তান বা আখরের তান প্রয়োগ করেন। এখানেই তিনি সত্যিকারের স্রষ্টা। আখরের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া পদাবলীর পদলালিত্য ও ভাবমাধুর্য প্রেমিক-শ্রোতার অন্তরে সহজেই সঞ্চার করতে পারে।

কাটান - আখরের মধ্য দিয়ে ভাবকে বিশ্লেষণ করে কীর্তনীয়াগণ যখন প্রকৃত স্থায়ীতে ফিরে আসেন তখন তাকে কাটান বলে। দ্রুত গতির সহজ

ছন্দোবদ্ধ কথা বার বার ঘুরেফিরে সমবেত উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়ার পর একটি কাটান শেষ হয় এবং শ্রোতার মনে ভাব-সন্ধিক্ষণ আশে। এই আখর ও কাটানে খোল কর্তালের ছন্দ-সংযোজনা মুক্তভাবে বিরামহীন চলতে থাকে এবং প্রতিটি বর্ণণাত্মক কথা – ভআষা ও সুরে নানাভাবে কাটানে এসে শেষ হয়। কাটানের সময় খোলে ধ্বনিত তাল-ফেরতা এবং করতালের বাদন সহযোগিতায় দোহারের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দোহার মূল অংশটিকে বার বার ঘুরেফিরে গেয়ে সংগতি রক্ষা করে চলে। এই আখরের মাঝে নূতন আখর যোজনা করাকে পরকাটান বলে।

দোহার- দোহার বলতে ধুয়াধারী গায়ককে বোঝায়। কীর্তন গানে মূল গায়কের পদের কিছু অংশ অনুসঙ্গি গায়কেরা পুনরাবৃত্তি করেন। এই প্রক্রিয়াকে দোহার বলে।

মাতন- মাতন হল কীর্তনের শেষ অংশ। এই অংশটি কীর্তনের আখরের সঙ্গে ব্যবহৃত বোল-ছন্দ বা দ্রুত 'পরণ', যা নৃত্যের ভাব প্রকাশক।

উপসংহার কীর্তন হল বাংলা তথা বাঙালীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে কীর্তনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ এই সঙ্গীতকে বাংলার মার্গ সঙ্গীত বলে থাকেন। কীর্তনের মধ্যে সাহিত্য বা কাব্য, সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটেছে। কীর্তনের ন্যায় কাব্য, সুর ও ধর্মের এমন অপূর্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম অন্য কোন সঙ্গীতে দেখা যায় না।

ছন্দোবদ্ধ কথা বার বার ঘুরেফিরে সমবেত উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়ার পর একটি কাটান শেষ হয় এবং শ্রোতার মনে ভাব-সন্ধিক্ষণ আশে। এই আখর ও কাটানে খোল কর্তালের ছন্দ-সংযোজনা মুক্তভাবে বিরামহীন চলতে থাকে এবং প্রতিটি বর্ণণাত্মক কথা – ভআষা ও সুরে নানাভাবে কাটানে এসে শেষ হয়। কাটানের সময় খোলে ধ্বনিত তাল-ফেরতা এবং করতালের বাদন সহযোগিতায় দোহারের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দোহার মূল অংশটিকে বার বার ঘুরেফিরে গেয়ে সংগতি রক্ষা করে চলে। এই আখরের মাঝে নূতন আখর যোজনা করাকে পরকাটান বলে।

দোহার- দোহার বলতে ধুয়াধারী গায়ককে বোঝায়। কীর্তন গানে মূল গায়কের পদের কিছু অংশ অনুসঙ্গি গায়কেরা পুনরাবৃত্তি করেন। এই প্রক্রিয়াকে দোহার বলে।

মাতন- মাতন হল কীর্তনের শেষ অংশ। এই অংশটি কীর্তনের আখরের সঙ্গে ব্যবহৃত বোল-ছন্দ বা দ্রুত 'পরণ', যা নৃত্যের ভাব প্রকাশক।

উপসংহার কীর্তন হল বাংলা তথা বাঙালীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে কীর্তনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ এই সঙ্গীতকে বাংলার মার্গ সঙ্গীত বলে থাকেন। কীর্তনের মধ্যে সাহিত্য বা কাব্য, সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটেছে। কীর্তনের ন্যায় কাব্য, সুর ও ধর্মের এমন অপূর্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম অন্য কোন সঙ্গীতে দেখা যায় না।